Belles-Lettre 2024, Vol. 2, pp. 165-176

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের ‘বিদিশা’ : নবজাগরণে নারী-জাগরণ

মেহেবুব আলম

পিএইচ.ডি. গবেষক, বাংলা বিভাগ, কোচবিহার পঞ্চানন বর্মা বিশ্ববিদ্যালয়।

আমাদের ব্রিটিশ সরকার দেশ থেকে তাদের সাম্রাজ্যবাদ গুটিয়ে নেবার ঠিক আগেই তারা তাদের শেষ পেরেকটি ঠুকেছিল দেশভাগের মধ্যে দিয়ে। ফলে দ্বিজাতি তত্ত্বের ভিত্তিতে ভারতবর্ষ দুটি পৃথক রাষ্ট্রে পরিণত হয়। মৃত্তিকা বিভাজনের পাশাপাশি এই বিভাজন ছিল দু’দেশে বহুকাল ধরে বসবাসকারী হিন্দু ও মুসলিম সম্প্রদায়ের মানুষের বিভাজন। ফলে উভয় দেশেই শুরু হয় সংখ্যালঘুর দেশত্যাগ। তবে পূর্ববঙ্গ থেকে যত সংখ্যক হিন্দু তাদের দেশত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছিল, সে তুলনায় খুবই অল্প সংখ্যক মুসলিম দেশত্যাগ করেছিল।

সাহিত্য যদি সমাজের দর্পণ হয়ে থাকে, তবে সাতচল্লিশের দেশভাগের দুঃখ-দুর্দশা, গৃহহীন উদ্বাস্তু মানুষের জীবন-যন্ত্রণা প্রভৃতি বিষয়গুলি উপাদান হিসাবে সাহিত্যিকদের হাতের কাছে যথেষ্ট প্রস্তুত ছিল। অথচ দেশহীন ও গৃহহীনদের কান্নার শব্দ পশ্চিমবঙ্গের পূর্ব প্রতিষ্ঠিত সাহিত্যিকদের তেমনভাবে স্পর্শ করতে পারেনি। ফলে আমরা ঠিক সে সময়ের এই বিষয়কেন্দ্রিক কোনও বড় সাহিত্য খুঁজে পাইনা। সাহিত্যিকগণ দেশভাগ নামক ইভেন্টকে ইচ্ছাকৃতভাবে যেমন ভুলে থাকতে চেষ্টা করেছেন তেমনি উদ্বাস্তুদের অভিজ্ঞতার সাথে তাঁদের জীবনের প্রত্যক্ষ পরিচয়ও ছিল না। ঠিক সে কারণেই বিশিষ্ট সমালোচক অশ্রুকুমার সিকদার বাংলা সাহিত্যের এই নীরবতাকে ‘বোবা বাংলা সাহিত্য’ বলে আখ্যায়িত করেছেন। এই প্রসঙ্গে প্রাবন্ধিক সন্দীপ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর *দেশভাগ—স্মৃতি আর সত্তা* গ্রন্থে জানিয়েছেন—

“লেখকরা প্রধানত নিজেদের সম্প্রদায়ের কথাই লিখেছেন; এবং সেখানেও তাঁরা সতর্ক হয়ে থেকেছেন, পাছে তাঁদের রচনা ‘সাম্প্রদায়িক’ বলে চিহ্নিত হয়ে যায়। ফলে রচনাগুলি হয়েছে কাট ছাঁট করা, প্রমাণমাপের। দুই বাংলার বেদনা আর বিপর্যয়ের কাহিনী অনেকটাই অলিখিত রয়ে গেছে আজও।”[১]

দুই.

বাংলা কথাসাহিত্যের জগতে নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় একজন অন্যতম বিশিষ্ট কথাসাহিত্যিক। সাহিত্যচর্চার প্রথমদিকে তিনি কাব্য চর্চায় নিমগ্ন থাকলেও কথাসাহিত্যিক হিসেবেই বাংলা সাহিত্যে নিজের স্থান পাকা করে নিয়েছেন। মন্বন্তর, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ, ছেচল্লিশের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা,

সাতচল্লিশের দেশভাগ ও উদ্বাস্তু সমস্যাগুলি তাঁর কথাসাহিত্যের বিষয় হয়ে উঠেছে। তিন পর্বে প্রকাশিত তাঁর প্রথম উপন্যাস ‘উপনিবেশ’ (১ম পর্ব ১৯৪৩), যা ‘ভারতবর্ষ’ পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়েছিল। কথাসাহিত্য ছাড়াও নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় প্রবন্ধ গ্রন্থ (*সাহিত্যে ছোটগল্প, ছোটগল্পের সীমারেখা*) এবং ‘শিশু-কিশোর সাহিত্য’ রচনাতেও মুন্সিয়ানার পরিচয় দিয়েছেন। কিশোর সাহিত্যে টেনিদা চরিত্রটি তাঁর একটি উল্লেখযোগ্য সৃষ্টি।

দেশভাগের সাহিত্য রচনায় নীরবতা নিয়ে যে কলঙ্কের বোঝা পশ্চিমবঙ্গের সাহিত্যিকদের মাথায় আরোপ করা হয়েছে, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ও তা থেকে নিস্তার পান নি। তবে তাঁর ‘বিদিশা’ নামক উপন্যাসটিতে দেশভাগ পরবর্তী প্রেক্ষাপট প্রসঙ্গকে খুঁজে পাওয়া যায়। দেশভাগ ও তার প্রভাবকে এই উপন্যাসে তিনি ইতিবাচকভাবে দেখিয়েছেন। তাঁর এই উপন্যাসটি ১৩৫৯ সালে প্রথম প্রকাশিত হয়েছে ডি-এম লাইব্রেরি থেকে। উপন্যাসটি তিনি তাঁর বন্ধু চিত্রপরিচালক শ্রী অর্ধেন্দু মুখোপাধ্যায়কে উৎসর্গ করেছেন। মাত্র আটষট্টি পৃষ্ঠার ক্ষুদ্র এই উপন্যাসটি সাতটি পরিচ্ছেদে পরিসমাপ্ত। উপন্যাসের নায়িকা বিদিশা, আর তার নামেই উপন্যাসের এই নামকরণ। এই উপন্যাসটির নাট্যরূপ একাধিকবার মঞ্চস্থ হয়েছে এবং অত্যন্ত জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে।

দেশভাগের উপন্যাসে আমরা মূলত লক্ষ করি হিন্দু-মুসলমানের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, হিংসা, ধর্ষণ, রক্তক্ষয়, মৃত্যু, দেশত্যাগ ও গৃহত্যাগের তীব্র যন্ত্রণা ইত্যাদি। কিন্তু এই সমস্ত বিষয়গুলিকে নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় তাঁর ‘বিদিশা’ উপন্যাসে এড়িয়ে গেছেন। দেশভাগের নেতিবাচক দিকগুলিকে তিনি আড়াল করে, তাকে ইতিবাচকে পরিণত করেছেন। আলোচ্য উপন্যাসে দেশভাগ বীণা, বিদিশা ও বিনতি তিনবোনেরই জীবনকে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছে। আমরা আলোচ্য প্রবন্ধে অন্বেষণের চেষ্টা করব যে, দেশভাগ কীভাবে বিদিশার মধ্যে তথা সমস্ত উদ্বাস্তু নারীদের মধ্যে একটা জাগরণ এনে দিয়েছিল। ঊনবিংশ শতাব্দীতে অবিভক্ত বাংলাদেশে নবজাগরণের পর, বিংশ শতাব্দীর বিভক্ত বাংলাদেশের এই জাগরণ বিশেষ করে ছিন্নমূল সহজ-সরল মানুষের যে পুনরায় নবজাগরণ তা বলা যায়।

তিন.

১৯৪৭ সালে দেশবিভাগের ফলে বহু পরিবারের ওপর দুর্ভাগ্যের কশাঘাত নেমে এসেছিল। এ উপন্যাসে বিদিশার পরিবারও সেই কশাঘাতের বলি। যদিও বিদিশা ও তার ছোট বোনের জীবনে দুর্ভাগ্যের সূচনা দেশ বিভাজনের পূর্বেই দেখা দিয়েছিল। এক দুর্ঘটনায় বিদিশা হারিয়েছে তার বাবা, মা ও দাদাকে। তখন থেকেই তারা দুই বোন তার জামাইবাবুর আশ্রয়ে বেড়ে ওঠে। আমরা জানি ছেচল্লিশের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় আমাদের দেশের বহু মানুষ তাদের প্রাণ হারিয়েছিল। কেউ হারিয়েছে স্বামী, তো কেউ পুত্র, আবার পিতৃহারা হয়েছিল অনেকেই। সেই দাঙ্গার এক ক্ষুদ্র চিত্র লেখক এখানে তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন। উপন্যাসে বিদিশার জামাইবাবুর মৃত্যু হয়েছে

সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায়, মুসলিম দাঙ্গাবাজদের হাতে। এই একটি মাত্র মৃত্যু ছাড়া গোটা উপন্যাস জুড়ে আমরা আর দ্বিতীয় কোনও মৃত্যুর খবর পাইনি। পাইনি দাঙ্গার আর অন্য কোনও ছবিও। হয়তো আখ্যানকার ইচ্ছাকৃতভাবেই তা দেখাতে চাননি। অথবা উর্বশী বুটালিয়ার মতো তিনিও সেই ভয়ঙ্কর রক্তক্ষয়ী দাঙ্গাকে মনে করেছেন—

"it was difficult to forget, but dangerous to remember"[২]

সাতচল্লিশের দেশভাগ মানুষকে নিমেষে ঘর থেকে বাইরে ছুঁড়ে ফেলেছিল। এক মুহূর্তেই তাদের মাথার ওপর থেকে ছাদ চিরতরে হারিয়ে গিয়েছিল। তবে দেশভাগের এই উত্তাল পরিস্থিতি পূর্ববঙ্গের সহজ-সরল মানুষগুলিকে অনেকটা পরিণতও করে তুলেছিল। বিশেষ করে নারীদের। কেননা তারা ছিল অসহায়। দাঙ্গা থেকে দেশভাগ দুটির কোনটিই নারীর দ্বারা সংঘটিত হয়নি, কিন্তু এই দুই ঘটনা নারীকেই বিশেষভাবে প্রভাবিত করেছিল। প্রাবন্ধিক সুমিতা চক্রবর্তী নারীর অসহায়তার প্রসঙ্গে জানিয়েছেন—

"যুদ্ধ নারীর কাছে সর্বাধিক সর্বনাশের সূচক। যুদ্ধে নারী তার পিতা, ভ্রাতা, স্বামী, পুত্র, পরিজনকে হারায়; নিজের পরিবার হারায় সেই সঙ্গে হারায় নিজের শারীরিক নিরাপত্তা ও সম্মান।"[৩]

আলোচ্য উপন্যাসে বিদিশার জামাইবাবুর মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই তাদের তিন বোনের মাথা থেকে চিরতরের স্থায়ী ছাদ নিমেষেই হারিয়ে যায়। স্বামীর মৃত্যুশোক মেনে নিতে না পেরে মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে ফেলে বড় বোন বীণা। তার প্রাপ্ত মানসিক আঘাতকে আমরা 'ট্রমা' বলে উল্লেখ করতে পারি। 'ট্রমা' শব্দটিকে বিভিন্ন জন বিভিন্নভাবে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করেছেন। তবে শব্দটির আভিধানিক অর্থ হল—

"a mental condition caused by severe shock, especially when the harmful effects last for a long time."[৪]

একদিকে জামাইবাবুর মৃত্যু এবং অন্যদিকে বড়দিদি বীণার মানসিক অবস্থার অবণতির কারণে সমস্ত দায়িত্ব এসে পড়ে উপন্যাসের কেন্দ্রীয় চরিত্র বিদিশার কাঁধে। বড়দিদি বীণা ও ছোটবোন বিনতিকে নিয়ে এক অজানা পথের উদ্দেশে পা বাড়ায় বিদিশা। দেশত্যাগের পর তারা নিজেদের নতুন করে চিনতে পারে 'রিফিউজি' নামের মধ্যে দিয়ে। আর ঠিক এসময় থেকেই বিদিশার মধ্যে যেন সমস্ত এবিলিটি চলে আসে। রাতারাতি সে যেন হয়ে ওঠে পরিণত মনস্কা। লোহা যেমন পুড়তে পুড়তে একসময় আকার দেবার উপযুক্ত হয়ে ওঠে। বিদিশার মনেও জামাইবাবুর মৃত্যু শোক, বড় দিদির উন্মাদনার শোক, ছোট বোনের ভবিষ্যৎ চিন্তা ইত্যাদি চাপগুলি তাকে ঠিক যেন লোহার মতই পুড়তে পুড়তে একেবারে পরিণত করে তোলে। এর ফলে তার মধ্যে নব রূপে জাগরণ লক্ষ করা যায়। তার এই নবজাগরণ পাশ্চাত্যের কারণে নয়, বরং বলা যায় সময়-সমাজ, পরিবেশ ও পরিস্থিতি তৎকালীন সময়ে বিদিশার মতো হাজারো নারীকে নবজাগরণে উদ্ভাসিত করেছিল।

চার.

আমরা জানি দেশভাগের পর পূর্ববঙ্গের ছিন্নমূল মানুষদের রিফিউজিতে পরিণত হবার পর কঠোর সংগ্রামের মুখে পড়তে হয়েছে। তাদের জীবনযুদ্ধ বেড়েছে শতগুণে। বাধ্য হয়ে ফাঁকা জমি জবরদখল করে তারা মাথা গোঁজার ঠাঁই করে নিয়েছে। এভাবেই কলকাতার বুকে ধীরে ধীরে তারা গড়ে তুলেছে উদ্বাস্তু কলোনি। আবার এই উদ্বাস্তু কলোনিকে রক্ষার তাগিদে তারা হাতে অস্ত্র তুলে নিয়েছে, গড়ে তুলেছে প্রতিরোধ ক্ষমতা। পুরুষের এই কর্মে নারীরাও সর্বতোভাবে সহযোগিতা করেছে। আর এই উদ্বাস্তু নারীদের আগুনের মতো দপ্ করে জ্বলে ওঠার মধ্যেও যে একটা নবজাগরণ লক্ষ করা যায়, যা এক কথায় অভূতপূর্ব। এই আগুন তারা পশ্চিমবঙ্গে তথা কলকাতা নগরী থেকে অর্জন করেছে। প্রতিকূল পরিস্থিতিই তাদের মনকে দ্রুত বেড়ে উঠতে সাহায্য করেছে। দেশবিভাগের ক্ষয়-ক্ষতি ও লোকসানের কথা আমাদের সকলেরই জানা। কিন্তু দেশভাগ পূর্ববঙ্গীয় উদ্বাস্তু নারীদের ক্ষেত্রে এক অর্থে শাপে বর হয়েছে তা বলা যায়। পূর্ববঙ্গের উদ্বাস্তু নারীদের এই উন্নয়নের কথা আমরা জানতে পারি মণিকুন্তলা সেনের স্মৃতি কথায়—

"ভালো লাগত ভেবে, আমাদের দেশে ট্রেন নেই বলে লোকে আমাদের কত উপহাসই না করেছে। কিন্তু এখন আমরা সেই ট্রেনে চেপেই হিল্লিদিল্লি অনায়াসে চষে বেড়াচ্ছি। আর ওই মেয়েরা? ছোটো ছোটো মেয়েরা পর্যন্ত স্টেশন থেকে একলা ওঠানামা করছে, নিজের কাজে একলা যাচ্ছে—একটুও ভয়ডর নেই। দেশে থাকলে বোধ হয় এত দ্রুত ও সহজে এঁরা জীবনের হাল ধরে সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারত না। শুধু নিজের জীবনের কেন—ওইসব মেয়েরা শক্ত হাতে পরিবারের হাল পর্যন্ত ধরেছে এবং নিজের জীবনের কথা আলাদা করে ভাবতেও ভুলে গেছে। আজ আর এঁরা ভেসে আসা মানুষ নেই। পশ্চিমবঙ্গের অল্প পরিসর জায়গায় বিশাল জনসমুদ্রে সকলের সঙ্গে মিলেমিশে একাকার হয়ে গেছে। পূর্ব বঙ্গের এইসব মেয়েরা শিক্ষিকা, নার্স, কেরানি—কোন কাজে নেই? বরং পশ্চিমবঙ্গের মেয়েদের তুলনায় এরাই সম্ভবত রুজির ক্ষেত্রে সংখ্যা গরিষ্ঠ।"[৫]

—এই সমস্ত নারী চরিত্রের সার্থক উদাহরণ হল আমাদের আলোচ্য উপন্যাসের নায়িকা বিদিশা। একদা বাংলাদেশের নিসর্গ প্রকৃতি তাদের গৃহময় করে রেখেছিল। দেশভাগ তাদের সেই ঘর থেকে ছুঁড়ে ফেলেছে বাইরে। পশ্চিমবঙ্গে এসে তারা হয়ে উঠেছে বিশ্বময়। এখন তাদের রক্তে রয়েছে সংগ্রাম। নিজের প্রাপ্য বুঝে নিতে তারা লড়াইয়ে অবতীর্ণ হয়েছে। তাদের মধ্যে এত দ্রুত যে পরিবর্তনগুলি এসেছে, তা বাংলাদেশে থাকাকালীন কখনই এত সহজে ও দ্রুত সম্ভব ছিল না। নতুন দেশে পৌঁছে বিদিশার কাঁধে একের পর এক বিভিন্ন দায়িত্ব চলে আসার কারণেই তার মধ্যে আত্মপ্রতিষ্ঠার তাগিদ লক্ষ করা গেছে। অবশ্য সে তার জামাইবাবুর আশ্রয়ে থাকাকালীন সময়েও আমরা লক্ষ করেছি, সে তার প্রতিষ্ঠিত হবার বাসনার কথা দিদিকে জানিয়েছিল। দিদির বাড়িতে জামাইবাবুর টাকায় বিলাসিতাকে সে কখনই মন থেকে মেনে নিতে পারেনি। বরং সেই বিলাসিতাকে সে তার জামাইবাবুর কৃপা হিসেবে মনে করেছে। একারণেই তার মধ্যে একটা

হীনমান্যতা বোধ সর্বদা কাজ করত। তাই কলকাতায় আসার পরেও সে তার নিজের মামা এবং জামাইবাবু সুপ্রকাশের মক্কেলের ওপর বোঝা হতে চায়নি। বিদিশার মধ্যে আত্মপ্রতিষ্ঠার যে চাহিদা রয়েছে, তা স্পষ্ট হয়ে ওঠে দিদির সঙ্গে তার এক আলাপচারিতায়—

“হ্যাঁ, ভালো করে পাস করতে হবে তাকে। পৌঁছুতেই হবে এম.এ পর্যন্ত। তারপরে যেখানেই হোক, চাকরি একটা জুটিয়ে নেবই। দাঁড়াব নিজের পায়ে, তারপরে—”[৬]

আত্মপ্রতিষ্ঠার এই ক্ষুধা তার মধ্যে পূর্বেই ছিল, কিন্তু রিফিউজি’তে পরিণত হবার পর কলকাতায় একে একে তার ব্যক্তি জীবনের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে বড় দিদি ও ছোট বোনের প্রতি দায়িত্ববোধ এবং সংসার পরিচালনার কর্তব্যবোধ। এই দায়িত্ব ও কর্তব্য বোধ একই সঙ্গে তাকে সময়ের বহু পূর্বেই পরিণত করে তুলেছে।

জলকে কোনও পাত্রে রাখা হলে, তা সে পাত্রেরই আকার ধারণ করবে। পূর্ববঙ্গের উদ্বাস্তু নারীরা কলকাতায় আসার পর এখানকার পরিবেশ ও পরিস্থিতির সঙ্গে তারা ধীরে ধীরে নিজেকে জলের মতো খাপ খাইয়ে নিতে শুরু করে। যেভাবেই হোক মাথা উঁচু করে বাঁচতেই হবে, এহেন ভাবনায় নিজেকে প্রস্তুত করে তারা ময়দানে অবতীর্ণ হয়েছে। সৎ কিংবা অসৎ যে কোনও পন্থাতেই তারা উপার্জন করতে ইচ্ছুক। সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের *‘অর্জুন’* উপন্যাসে দেশপ্রাণ কলোনির পূর্ণিমা চরিত্রটিকে পতিতাবৃত্তি অবলম্বন করতেও দেখা যায়, শুধুই সমাজে বেঁচে থাকার তাগিদে। আরও নির্দিষ্ট করে বললে বলতে হয়, এই বাঁচা যেন প্রকৃত অর্থে বেঁচে থাকে নয়, বরং যে কোনও মূল্যের বিনিময়ে সমাজে নিজেদের অস্তিত্বকে শুধু টিকিয়ে রাখা মাত্র। আলোচ্য উপন্যাসে বিদিশার মধ্যেও বেঁচে থাকার তাগিদ রয়েছে ঠিকই, তবে তা মূলত সৎ ভাবে এবং মাথা উঁচু করে। বিদিশা তার এই আত্মমর্যাদা’কে রক্ষা করে গেছে উপন্যাসের শেষ পর্যন্ত।

পাঁচ.

উপন্যাসের দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে দেখা যায়, রামকৃষ্ণ ঘোষের সহযোগীতায় বিদিশা এক মেয়েদের স্কুলে শিক্ষকতার চাকরি পেয়েছে। রামকৃষ্ণ ঘোষ সেই স্কুলের সেক্রেটারি। মাসিক একশত টাকা বেতনে তিনি বিদিশাকে তার স্কুলে চাকরিতে নিযুক্ত করেন। শিক্ষকতার এই চাকরির জন্যই গ্রাজুয়েট বিদিশাকেও স্কুলের দরজায় দরজায় ঘুরতে হয়েছে, অপমানিত হতে হয়েছে বারবার। বিদিশার মাধ্যমে আখ্যানকার এই উপন্যাসে ফুটিয়ে তুলেছেন তৎকালীন পূর্ববঙ্গীয় শিক্ষিতা উদ্বাস্তু নারী-সমাজকে; যাদের পেটে বিদ্যে রয়েছে, অথচ কর্মসংস্থান নেই। যারা নিতান্তই অসহায়, সম্বলহীনা, যারা সেদিন মাথা উঁচু করে সম্মানের সঙ্গে বাঁচতে চেয়েছিল, তারা বিদিশার মতোই সমস্ত অপমান মুখ বুজে সহ্য করেছে একটুখানি ভিত খুঁজে পাবার আশায়। তাই আখ্যানকার জানিয়েছেন—

“পাঁচ-সাত বছর আগেও এমন ছিল না। মেয়েদের স্কুলে একটি ভালো টিচার পাওয়া দঃসাধ্য ছিল,

একজন গ্রাজুয়েটকে দু-তিনটি ইস্কুলে টানাটানি করত। কিন্তু রাতারাতি সব বদলে গেছে। ...আজ আর বি.এ, এম.এ-দের সেধে আনতে হয়না, মেয়েদের ইস্কুলের দরজায় তারা ধরনা দিয়ে বেড়ায়।”[৭]

—অর্থাৎ বোঝাই যাচ্ছে জীবন সংগ্রামে অবতীর্ণ হয়ে পূর্ববঙ্গীয় লাজুক প্রকৃতির নারীদের আজ কোনও কিছুতেই আর দ্বিধা নেই, সংকোচ নেই, নেই কোনও লাজ-লজ্জা। অনিশ্চয়তার চোরাবালিতে জীবন ধারণের জন্য একটা কিছু শক্ত ভিত পেলেই তারা তা আকড়ে ধরে বাঁচার চেষ্টা করেছে।

বিংশ শতাব্দীতে নোয়াখালির সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা থেকেই উদ্বাস্তু স্রোত পূর্ববঙ্গ থেকে পশ্চিমবঙ্গে আসার সূত্রপাত ঘটেছিল এবং দেশবিভাগের পর তা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেতেই থাকে। পশ্চিম পাকিস্তান থেকে আসা প্রায় সমস্ত উদ্বাস্তুদের কেন্দ্রীয় সরকার পুনর্বাসন দিতে সক্ষম হলেও, পূর্ব পাকিস্তান থেকে পশ্চিমবঙ্গে আসা উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসনের ক্ষেত্রে নেহরুর মধ্যে এক প্রকার উদাসীনতা লক্ষ্য করা যায়। এ ব্যাপারে ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় উদ্বাস্তু পুনর্বাসনে কিছু প্রচেষ্টা চালালেও তাঁর সরকার এক্ষেত্রে সম্পূর্ণ সাফল্য লাভ করেনি। তবে তাঁর সদিচ্ছা ও উদ্যোগের অভাব ছিল না। আমাদের মনে রাখতে হবে যে, দেশভাগ ও স্বাধীনতা-উত্তরকালের বিশাল উদ্বাস্তু ঢেউ সামলানো একটি রাজ্যের একার পক্ষে কখনই সম্ভব ছিল না, কেননা এই সমস্যা রাজ্যস্তরকে অতিক্রম করে হয়ে উঠেছিল জাতীয় সমস্যা।

অভাবের দিনে বিদিশাকে স্কুলের চাকরি দিয়ে রামকৃষ্ণ ঘোষ তাকে ভবিষ্যৎ বিপদের হাত থেকে রক্ষা করেছে, আপাত দৃষ্টিতে তা ঠিক বলেই মনে হয়। কিন্তু এই সহজ সরল বিষয়টির পেছনে রামকৃষ্ণ ঘোষের এক ক্ষুদ্র স্বার্থ লুকিয়ে রয়েছে। উদ্বাস্তু মেয়েরা যে অসহায়, একথা তৎকালীন কলকাতা মহানগরীর সকলেরই জানা ছিল। তাই সেই অসহায়তার সুযোগ নিয়েছে অনেকেই। রামকৃষ্ণ তাদেরই একজন। বিদিশার বিপদের দিনে তার পাশে দাঁড়িয়েছেন এই উদ্দেশ্য নিয়ে, যাতে অদূর ভবিষ্যতে তাকে দিয়ে রামকৃষ্ণ আখের গোছাতে পারেন। আর এই স্বার্থসিদ্ধির কাজে তিনি একা নন, যুক্ত রয়েছে তার নাতি অমলও। এক্ষেত্রে তারা দুজনই একই পথের পথিক। আসলে কথাকার এই দুই চরিত্রের মধ্যদিয়ে তৎকালীন কলকাতা মহানগরীর উচ্চশ্রেণির লোভী স্বার্থান্বেষী মানুষের স্বরূপকে চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়েছেন।

ছয়.

সম্পূর্ণ উপন্যাস জুড়ে এক উদ্বাস্তু নারী তথা উপন্যাসের নায়িকা বিদিশার জীবনসংগ্রামকে আখ্যানকার ফুটিয়ে তুলেছেন। আমরা তার এই জীবন সংগ্রামকে দুটি পর্বে ভাগ করতে পারি। একটি হল দেশ বিভাজনের পূর্বেকার, অর্থাৎ যা ছিল তার একান্ত ব্যক্তিগত, যা ছিল তার শুধুই আত্মপ্রতিষ্ঠার মধ্যে সীমাবদ্ধ। আর অপরটি হল দেশ বিভাজন পরবর্তী, অর্থাৎ আত্মপ্রতিষ্ঠার

পাশাপাশি দায়িত্ববোধ বা কর্তত্ববোধের লড়াই। নিজের শিক্ষকতা সামলে, বড়দিদি বীণা ও ছোটবোন বিনতির প্রতি সমস্ত দায়িত্ব পালনের পরেও তাকে তার সংসার দেখতে হয়। এই দায়িত্ববোধই যেন তাকে ভেতর থেকে কুরে কুরে খাচ্ছে। আর এই সমস্ত চাপের একত্র সমাহারে বিদিশা নিজেকেই প্রায় ভুলতে বসেছে। তথাপি সে তার ছোটবোনের জন্য বাঁচিয়ে রাখতে চায় এক টুকরো আকাশ, যাতে বিনতি স্বপ্ন দেখতে পারে। কেননা বাবা-মা-জামাইবাবুর অনুপস্থিতিতে সে এখন তার একমাত্র ছোটবোনের অবিভাবক। বিনতির জন্য বিদিশার অবিভাবক সুলভ ভাবনা আখ্যানকারের বক্তব্যে ধরা পড়ে—

"ছোট বোন। বয়েস বাড়লেও মন যে বাড়ে নি, বিদিশা তা জানে। ওর প্রত্যেকটা সাধ-আহ্লাদ তারও মেটাতে ইচ্ছে করে, এক বিন্দু দুঃখ দিতেই কি চায় বিদিশা? জীবনের সমস্ত বিষ সে-ই পান করে নিক নিঃশেষে—অন্তত বিনতির জন্যে থাকুক কিছু গান, কিছু স্বপ্ন, সুরে একটা মুক্তির আকাশ।"[৮]

—এ প্রসঙ্গে আমাদের শক্তিপদ রাজগুরুর *মেঘে ঢাকা তারা* উপন্যাসের কথা মনে পড়ে যায়। সেখানেও আমরা একই বিষয় লক্ষ করি। পরিবারে বয়স্ক বাবা ও বড় দাদা বেকার থাকার কারণে পরিবারের জন্য নিজের শরীরের শেষ রক্তবিন্দু দিয়ে খেটে গেছে উপন্যাসের নায়িকা নীতা। পরিবারের সকল সদস্যকেই তার ওপর নির্ভর করতে হয়। সকলের আবদার মেটাতে মেটাতে শেষে কঠিন ব্যধিতে আক্রান্ত হয়ে পড়েছে সে। বিদিশার মত সেও নিজেকে তিলে তিলে সঁপে দিয়েছে পরিবারের কাছে। এই দৃষ্টিকোণ থেকে দুটি উপন্যাসের নায়িকা চরিত্রই এক শ্রেণিতে অবস্থান করেছে। একদিকে বিদিশা চেয়েছিল তার ছোট বোনের জন্য এক টুকরো আকাশ বাঁচিয়ে রাখতে, বড় দিদির কাছে অন্ধের যষ্টি হতে। সে কারণেই বড়দিদি ও ছোটবোনের জন্য সে যেন এক লক্ষ্মণ রেখা এঁকে দিয়েছে, যার ভেতরে তারা নিরাপদ। আর বাইরের সমস্ত দুঃখ, আঘাতের মুখোমুখি হতে সে প্রস্তুত।তাই লেখক জানিয়েছেন—

"বীণা ভালো হয়ে যাবে—বিনতি কোথাও এত টুকুও ভুল করবে না। যে গণ্ডি বিদিশা ওদের জন্য টেনে দিয়েছিল, সেখানে ওঁরা অন্তত নিশ্চিন্ত হয়ে থাকুক। তারপর বাকি সমস্ত আঘাতগুলো রইল তারই জন্যে—"[৯]

আবার অন্যদিকে বিদিশার মতো *মেঘে ঢাকা তারা-র* নীতাও নিজের লেখাপড়া ও কাজকর্মের পরেও চেয়েছে সকলের মুখে হাসি ফোটাতে—

"নিজের পড়াশোনা, তারপর কাজকর্ম—তবু আনন্দ পায় নীতা আর পাঁচজনের মুখে হাসি ফুটুক। মনের কোনে একটা সুর জাগে ; গুনগুনানি সুর।"[১০]

বিশ শতকের পঞ্চাশের দশকে উত্তাল পরিস্থিতিতে অনেক মধ্যবিত্ত উদ্বাস্তু পরিবারের শিক্ষিতা মেয়েরাই সংসারের সমস্ত দায়িত্ব নিজের কাঁধে তুলে নিয়েছিল। একদিকে সৎ পথে অর্থ উপার্জন, অন্যদিকে আত্মমর্যাদা'কে টিকিয়ে রাখার লড়াইয়ে শেষ পর্যন্ত তারা নিজেরাই নিস্তেজ হয়ে

গিয়েছিল। তারা ভুলে গিয়েছে তাদের মনের কামনা-বাসনাকে, ভুলেছে তাদের যৌবনকে। সমস্ত চাওয়া-পাওয়াগুলিকে পদতলে দাবিয়ে তারা শুধু অর্থ উপার্জন করে গেছে পরিবারকে ভবিষ্যৎ অন্ধকার থেকে রক্ষার স্বার্থে।

সাত.

পূর্ববঙ্গীয় উদ্বাস্তুদের আমরা তিনটি শ্রেণিতে বিভক্ত করতে পারি। এই তিন শ্রেণির মধ্যে প্রথমটিতে রয়েছে— যারা ওপার থেকে এপারে এসে মূলত স্টেশনগুলিতে ভীড় করেছিল। তারা সম্পূর্ণভাবে সরকারের ওপর নির্ভরশীল ছিল। তাদের কেউ কেউ স্টেশনগুলিতেই স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করে ছিল। আবার অনেকে সরকার ও এনজিও পরিচালিত বিভিন্ন ক্যাম্পগুলিতেও ভীড় করেছিল। রানাঘাট, ফুলিয়া, ধুবুলিয়া, কুপার্স ইত্যাদি উদ্বাস্তু শিবিরগুলি তারই উদাহরণ। অনেকে আবার সেখানেই সরকারের চিরস্থায়ী পোষ্য বা পারমানেন্ট লিয়াবিলিটি (PL) হিসেবে থেকে গিয়েছে। এই ধরনের উদ্বাস্তুদের কথা উঠে এসেছে নারায়ণ সান্যালের *বকুলতলা পি. এল. ক্যাম্প* (১৯৫৫), অজিত দাসের *ভাগফল* (১৯৫৬), দুলালেন্দু চট্টোপাধ্যায়ের *ওরা আজো উদ্বাস্তু* (১৯৮৩), অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়ের *দেবীমহিমা* (১৯৮৪) ইত্যাদি উপন্যাসগুলিতে। দ্বিতীয় শ্রেণিতে রয়েছে সেই সমস্ত উদ্বাস্তুরা, যারা সরকারের কৃপার আশায় না থেকে, নিজের তাগিদে কলকাতার বুকে ফাঁকা জমি জবরদখল করে মাথা গোঁজবার ঠাঁই করে নিয়েছে। শুধু তাই নয় তারা পুলিশ ও জমির মালিকের বিরুদ্ধে সংঘবদ্ধ হয়ে প্রতিরোধ গড়ে তুলেছে। এভাবে পশ্চিমবঙ্গের বুকে গড়ে উঠেছে হাজারো উদ্বাস্তু কলোনি। যাদবপুর, বাঘাযতীন, নেতাজী কলোনি, বিজয়গড় ইত্যাদি কলোনিগুলি তারই যথার্থ উদাহরণ। এই সমস্ত উদ্বাস্তু কলোনির কথা উঠেছে এসেছে সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের *অর্জুন* (১৯৭১), নারায়ণ সান্যালের *বল্মীক* (১৯৮৩), শচীন দাশের *উদ্বাস্তু নগরীর চাঁদ* (২০০৮) কিংবা *মানচিত্র বদলে যায়* (২০১৪) ইত্যাদি উপন্যাসগুলিতে। আর তৃতীয় শ্রেণিতে রয়েছে সেই সমস্ত উদ্বাস্তুরা, যারা প্রথম দুই শ্রেণির একটিতেও নেই। অর্থাৎ তারা কখনই সরকারের ওপর নির্ভরশীল ছিল না, অথবা অন্যের জমি জবরদখল করারও প্রয়োজন হয়নি। বরং তারা নিজের আত্মসম্মান বোধকে বাঁচিয়ে রেখে সৎ পন্থায় অর্থ উপার্জন করেছে। তবে এই তৃতীয় শ্রেণির উদ্বাস্তুর সংখ্যা খুবই সামান্য। আমাদের আলোচ্য উপন্যাসের নায়িকা বিদিশা এই তৃতীয় শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত। এই সমস্ত নারী চরিত্রের সংখ্যা খুব বেশি নয় ঠিকই, তবে সেই বিরল ঘটনাগুলিকেই সাহিত্যের পাতায় স্থান দিয়েছেন নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, শক্তিপদ রাজগুরুর মত কথাকারেরা।

বিদিশার এই সংগ্রামে উপশম জুগিয়েছেন স্কুল সেক্রেটারি রামকৃষ্ণ। নতুন দেশে আসার পর বিদিশার কাছে একমাত্র রামকৃষ্ণকেই তার আপন বলে মনে হয়েছে। যদিও সেই বিশ্বাস উপন্যাসের শেষ পর্যন্ত আর রক্ষিত হয়নি। দেশভাগের পরে উদ্বাস্তুদের মধ্যে যে কর্মসংস্থানের চাহিদা লক্ষ করা গেছে, সেই সুযোগকে কাজে লাগিয়ে রামকৃষ্ণ ও অমলের মতো কিছু সুযোগ

সন্ধানী স্বার্থান্বেষী মানুষ নিজের স্বার্থ চরিতার্থ করতে বিদিশার মতো অসহায় নারীকে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছে। রামকৃষ্ণের উদ্দেশের কথা স্বয়ং তার কাছেই জেনেছে বিদিশা—

"মিসেস চ্যাটার্জিকে তাড়াবার ফিকির আমি খুঁজছি, সেই সঙ্গে ফাঁকিবাজ কোনও টিচারকেও আর রাখব না। তুমি প্রত্যেকের সম্পর্কে একটা করে মান্থলি রিপোর্ট আমাকে দেবে।...দয়া করে চাকরি দিয়েছিলাম—পায়ে ধরে কেঁদেছিলে সেদিন। আজ দেখছি, অযোগ্যকে দয়া করাতেও বিপদ আছে।"[১১]

অপমান সহ্য করেও বিদিশাকে অন্যের কৃপার পাত্রী হয়ে না থাকার উদাহরণ আমরা এর আগে অনেকবার পেয়েছি। এবারও তার ব্যতিক্রম হয়নি। বিপদের দিনে পাশে দাড়ানোর কারণে রামকৃষ্ণকে সশ্রদ্ধ প্রণাম জানিয়ে তার দেওয়া চাকরি বিদিশা স্বেচ্ছায় ছেড়ে দিয়েছে।

আট.

রামকৃষ্ণ ঘোষের নাতি অমলের কথা এ প্রসঙ্গে না বললেই নয়। কেননা সে হল তার দাদু রামকৃষ্ণের মতি, মুদ্রার আর এক পিঠ। বিদিশা যখন রামকৃষ্ণের স্কুলে মন দিয়ে চাকরি করছে, তখন এই অমিতই নিত্যদিন স্কুলে গিয়ে এক প্রকার উপযাচক হয়ে বিদিশার সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপনের চেষ্টা করেছে। নতুন স্কুল তৈরি করা ও তাতে ইনচার্জ হিসেবে বিদিশার দায়িত্ব গ্রহণের স্বপ্ন দেখানো এবং দেড়শ' টাকা মাইনের লোভ দেখিয়ে অবশেষে বিদিশার বিশ্বাস অর্জন করতে সে সফল হয়েছে। একদা যে বিদিশার কাছে ছিল রামকৃষ্ণই ছিল একমাত্র আশ্রয়স্থল, এখন সেই বিদিশারই মনে হচ্ছে রামকৃষ্ণের আশ্রয় সে যদি হারিয়ে ফেলে, তবে তার কাছে দ্বিতীয় অপশন হিসেবে অমল রয়েছে। অমলের প্রতি এক অগাধ বিশ্বাস জন্মেছে বিদিশার মনে। সেই বিশ্বাসের জোরেই চাকরি থেকে রিজাইন দিয়েছে। এখন তার একমাত্র লক্ষ্য অমলের স্কুল। আমরা যে নারী জাগরণের কথা আলোচনা করছি, বিদিশার এহেন মানসিক পরিবর্তন তার যেন যথার্থ উদাহরণ। কেননা যে বিদিশা নিজে থেকে কখনই অমলের গাড়িতে চাপতে চায়নি, সে এখন নিজেই বলছে—

"চলুন, আজ আপনি আমাকে লিফট্ দেবেন। চা খাওয়াবেন।...পেছনে নয়—একা একা ওখানে বসতে আমার ভালো লাগে না। আমি পাশেই বসব আপনার।"[১২]

—এই যে বিদিশার মানসিক পরিবর্তন বা নবজাগরণ যাই বলি না কেন তা কলকাতা নগরী তাকে হাতে-কলমে শিখিয়েছে। দাদু ও নাতির এই দ্বন্দ্ব তাকে অনেকটাই অভিজ্ঞ ও পরিণত করে তুলেছে। কিন্তু কলকাতার এই নগ্ন রূপ বেশিক্ষণ বিদিশার সামনে আবৃত থাকে নি। সত্যের উন্মোচন ঘটতেই বিদিশা তার স্বপ্নের জগৎ থেকে বাস্তবে মাটিতে পতিত হয়। বেরিয়ে পড়ে কলকাতার নাগরিক জীবনের আসল রূপ-রস-গন্ধ। ফলে বিদিশার মোহভঙ্গ ঘটে। তার এই মোহভঙ্গ ঘটে একমাত্র মীরার কারণেই। হঠাৎ মীরার উপস্থিতি বিদিশাকে তার অবস্থান স্পষ্ট করে

দেয়। অমলের বিজনেস পার্টনার হবার যে সুপ্ত বাসনা বিদিশার মনে জন্মেছিল, তা পূর্ণতা লাভের পূর্বেই ভেঙে চুরমার করে দেয় মীরা। সেই মুহূর্তে বিদিশা অনুভব করে, সে কারো কাজের সঙ্গী হবার যোগ্য নয়, বরং সকলে তাকে সিঁড়ির মতো ব্যবহার করে, সামনে এগিয়ে যাবার জন্য। বিদিশার সেখানে শুধুমাত্র অন্যের এগিয়ে চলার মাধ্যম হিসেবে কাজ করে গেছে। নিজেকে সিঁড়ির সঙ্গে তুলনা করে বিদিশা বলেছে—

"সিঁড়ি—সে সিঁড়ি বটে ! একদিন তাকে আশ্রয় করে মণিলাল চেয়েছিল বিনতিকে। আর আজ তারই ওপরে ভর দিয়ে অমল মীরাকে স্পর্শ করতে চায়।"[১৩]

নয়.

আলোচ্য উপন্যাসে নায়িকা বিদিশার দু-একবার নয়, বরং একাধিকবার বিশ্বাস ভেঙেছে বিভিন্ন জন। প্রথমে তার সঙ্গে বিশ্বাস ঘাতকতা করেছে মণিলাল, যাকে বিদিশা ভালোবাসতে শুরু করেছিল, সেই মণিলালকেই একদা বিদিশা দেখে তারই ছোট বোনের সঙ্গে এক বিশেষ অন্তরঙ্গ মুহূর্তে। দ্বিতীয়বার বিদিশার বিশ্বাস ভেঙ্গেছে তার অন্তপ্রাণ ছোটবোন বিনতি। বিদিশার নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে সে সিনেমার রঙিন জগতে প্রবেশ করেছে এবং বাড়ি ছেড়ে বেরিয়ে গেছে। আরও পরে একই কাজ করেছে রামকৃষ্ণ এবং এই তালিকার সবশেষে রয়েছে অমলও। ফলে সমগ্র উপন্যাস জুড়ে বিশ্বাসের ক্রাইসিস লক্ষ করা যায়। প্রতিবার বিশ্বাসভঙ্গের সঙ্গে সঙ্গে বিদিশার অভিজ্ঞতাও উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেয়েছে। বারংবার তার বিশ্বাস ভঙ্গের পরেও, আখ্যানকার তাঁর আখ্যানের নায়িকাকে নেতিবাচক দিক থেকে ইতিবাচকে ফেরান। হোঁচট খাওয়া বিদিশাকে তিনি আবার দাঁড় করান এবং আবারও পথ চলার জন্য প্রস্তুত করেন। বিদিশার প্রতি আখ্যানকারের অগাধ বিশ্বাস। তাই স্বয়ং আখ্যানকার তাঁর বয়ানে বিদিশা সম্পর্কে ঘোষণা করেন—

"আজ হয়তো অসহ্য ক্লান্তি বোধ হচ্ছে, আজকের রাতটা হয়তো একটা অনন্তহীন শূন্যতা দিয়ে ছাওয়া। কিন্তু এ গ্লানি কাল থাকবে না। আবার বিদিশা সোজা হয়ে দাঁড়াবে, আবার পথ হাঁটবে, দুবার যে ভুল করেছে, তৃতীয়বার আর তা করবে না।"[১৪]

আলোচ্য আখ্যানে দেখা যায় নাগরিক সমাজ পুরোপুরিভাবে জটিল-কুটিল মানুষ দ্বারা পরিপূর্ণ। সেই সমাজের স্বার্থান্বেষী মানুষদের সঙ্গে বিদিশা একা লড়াই করতে করতে যেন ক্লান্ত ও পরিশ্রান্ত। তাই তার বিশ্রাম প্রয়োজন। নাগরিক জীবনের যে মোহজালে সে এতদিন আটকে পড়েছিল, সেই জাল এবার ছিন্ন করে সে বেরিয়ে যেতে চাইছে। দরকার একটি সুযোগের। আখ্যানের একেবারে সমাপ্তিতে আমরা দেখতে পাই, বিদিশার বাড়ির মালিক পরমানন্দ তাকে সেই সুযোগ করে দিয়েছে। তার দেওয়া চাকরির সন্ধান সঙ্গে সঙ্গেই বিদিশা দু'হাত ভরে গ্রহণ করে। অত্যন্ত গ্রাম্য এলাকা। মাইনে মাত্র আশি টাকা। কিন্তু বিদিশা এই নতুন চাকরিকে স্বেচ্ছায় আকড়ে ধরেই নাগরিক জীবন থেকে নিজেকে অনেক দূরে সরিয়ে নিয়ে যেতে চেয়েছে। এই নতুন চাকরিকে কেন্দ্র করেই সে

পুনরায় স্বপ্ন দেখতে শুরু করে। দিদিকে নিয়ে আবারও বেঁচে থাকার রসদ সে খুঁজে পায়। বেতন সামান্য হলেও, নিতান্ত গ্রাম্য পরিবেশে, প্রকৃতির সহচর্যে বিদিশা মানসিক শান্তি তথা আক্ষরিক অর্থে বেঁচে থাকার প্রকৃত আনন্দ সে ফিরে পেয়েছে।

উদ্বাস্তুদের নিয়ে রাজনীতি দেখা গিয়েছে পঞ্চাশের দশকে। এই সময়েই কংগ্রেস সরকারের উদাসীনতাকে কাজে লাগিয়ে বামপন্থী দলগুলি সক্রিয় হয়ে ওঠে এবং প্রতিবাদী রাজনীতি গড়ে তোলে। উদ্বাস্তুদের বিশ্বাস অর্জন করে রাজনৈতিক পালাবদল ঘটিয়ে বামপন্থী দল ক্ষমতায় আসে। কিন্তু তারপরেও উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসন দেওয়া হয়নি। বরং মরিচঝাঁপি'র সেই নৃশংস হত্যাকান্ড বামপন্থী রাজনীতির ইতিহাসে কালো অধ্যায় হয়ে রয়ে গেছে। তৎকালীন সময়ে উদ্বাস্তুদের নিয়ে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্নভাবে রাজনীতির স্বার্থে ব্যবহার করেছিল বিভিন্ন রাজনৈতিক দলগুলি। আবার আমাদের আলোচ্য উপন্যাসের নায়িকা বিদিশাকে তৎকালীন সমাজের উচ্চশ্রেণির স্বার্থান্বেষী মানুষেরা তাদের ব্যক্তিগত স্বার্থে ব্যবহার করেছে। রামকৃষ্ণ ও অমলের ব্যক্তিস্বার্থের জাঁতাকলে পিষ্ট হয়ে বিদিশার স্বপ্ন ও বিশ্বাসে ফাটল ধরেছে, যা তার মধ্যে সৃষ্টি করেছে নাগরিক সমাজ ও নগরকেন্দ্রিক সভ্যতার প্রতি এক বিতৃষ্ণা। ফলে সে নগরিক কলকাতার সমাজ থেকে নিজেকে গুটিয়ে নিয়ে এক প্রত্যন্ত গ্রামে ফিরে গেছে।

আলোচ্য উপন্যাসের কেন্দ্রীয় বিষয় দেশভাগ নয়, তবে দেশভাগের প্রসঙ্গ উপন্যাসে এসেছে স্থানিক ও কালিক প্রয়োজনে। উপন্যাসের আদি-মধ্য-অন্ত্য যেহেতু বিদিশার সংগ্রামকেই মূলত ফুটিয়ে তোলাই ছিল লেখকের একমাত্র উদ্দেশ্য, তাই এই উপন্যাস হয়ে উঠেছে বিদিশার সংগ্রামের ইতিহাস তথা নারীজাগরণের আলেখ্য। উপন্যাসের ভূমিকা অংশে এই উপন্যাস সম্পর্কে এক উদ্ধৃতি উপস্থাপনের মাধ্যমে আমরা আমাদের আলোচনায় ইতি টানব—

"লেখক নৈর্ব্যক্তিক ভাবে দেশহারা উদ্বাস্তু মানুষের জীবন-যন্ত্রণা ও সেই সঙ্গে এপার বাংলার শিক্ষিত ধনী সুযোগ-সন্ধানী সম্প্রদায়ের সেই ছিন্নমূল মানুষদের কাজে লাগিয়ে স্বার্থসিদ্ধির নগ্ন প্রচেষ্টাকে উন্মুক্ত করেছেন এই গ্রন্থে।"[১৫]

তথ্যসূত্র—

১) বন্দ্যোপাধ্যায়, সন্দীপ *দেশভাগ : স্মৃতি আর সত্তা,* প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ : জানুয়ারি ১৯৯৯, পৃ. ৫

২) Butalia, Urvashi, *The Other Side of Silence*, Penguin, 1998, পৃ. ৩৫৭

৩) চক্রবর্তী, *সুমিতা ছোটগল্পের বিষয়-আশয়* পুস্তক বিপণি, কলকাতা, দ্বিতীয় সংস্করণ : অগাস্ট ২০১৬, পৃ. ৯৯

৪) *OXFORD ADVANCED LEARLER'S DICTIONARY*, Oxford University Press, Sixth edition 2000, পৃ. ১৩৮৪

৫) সেন, মণিকুন্তলা '*জনজাগরণে নারীজাগরণে' (সেদিনের কথা)*, থীমা ২০১০, কলকাতা, পৃ. ১৬৯

৬) নারায়ণ, গঙ্গোপাধ্যায়, *বিদিশা রচনাবলী* ৯, মিত্র ও ঘোষ, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ : আশ্বিন ১৩৯২, পৃ.৭

৭) তদেব, পৃ. ২৪

৮) তদেব, পৃ. ৩১

৯) তদেব, পৃ. ৫৪

১০) রাজগুরু, শক্তিপদ *মেঘে ঢাকা তারা* দে'জ, কলকাতা, প্রথম দে'জ সংস্করণ : জানুয়ারি ২০০১, সেপ্টেম্বর ২০১৮ পৃ. ১৮

১১) নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় '*বিদিশা'*, তদেব, পৃ. ৬০

১২) তদেব, পৃ. ৬২

১৩) তদেব, পৃ. ৬৬

১৪) তদেব, পৃ. ৬৭

১৫) তদেব, (ভূমিকা অংশ)